Vol. 43 | No. 3 | 2000

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশের রথ ও রথের অলংকরণ

Volume	43
Issue	3
Year	2000
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আব্দুস সাত্তার
Published online	June 1, 2000
DOI	10.62328/sp.v43i3.407
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v43i3.407
Pages	১১-১৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলাদেশের রথ ও রথের অলংকরণ

আব্দুস সাত্তার*

রথ হচ্ছে চক্রযুক্ত যান বা শকট। কিংবা বলা যায় অশ্বাদি-বাহিত প্রাচীন যান। কিংবা হিন্দু দেবতা জগন্নাথের যান। রথযাত্রা বলতে সাধারণত আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে হিন্দু উৎসবকেই বুঝায়। রথ টানা স্মরণ করিয়ে দেয় রথযাত্রায় ভক্তদের রজ্জুবদ্ধ রথ টানার উৎসবকে। সুতরাং রথের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের যেমন গভীর সম্পর্ক রয়েছে তেমনি রয়েছে ঐতিহ্যের সম্পর্ক। ঐতিহ্যবাহী এই রথ নির্মাণে সূত্রধর শিল্পীরা অসামান্য অবদান রেখেছেন। দেবালয় এবং মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে যে-কারিগরি দক্ষতা, যে-নিপুণতা এবং যে-ধৈর্যের প্রয়োজন হতো রথ নির্মাণের ক্ষেত্রেও সূত্রধর শিল্পীরা সেই দক্ষতা, নিপুণতা এবং ধৈর্যের প্রমাণ রেখেছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রথ টানার উৎসব হতো, কিন্তু দেশবিভাগের পর ব্যাপক হারে হিন্দু সম্প্রদায় ভারতে চলে যাওয়ায় এবং জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় রথ-উৎসব এবং রথ তৈরিতে ভাটা পড়ে। রথ নির্মাণে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হতো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে তা ব্যয় করা সম্ভব হতো না। ফলে রাজা মহারাজা এবং জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হতো। রাজা, জমিদার কিংবা বিত্তশালী ব্যক্তিদের সহায়তায় যে রথ তৈরি হতো তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার এক আখড়ার মহন্ত মস্তরামজী ১৭৪২ খিস্ট্রাব্দে নাটোরের রাজা রামকান্ত রায়ের অর্থানুকূল্যে ৩২ চাকা এবং ১৭ চূড়াযুক্ত একটি রথ নির্মাণ করেছিলেন[১]। রাজা রামকান্ত রায় রাজকার্য পরিচালনার চেয়ে ধর্মকর্মের প্রতি অধিক আগ্রহী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী স্বনামধন্যা রানী ভবানীও বহু মন্দির নির্মাণ এবং ধর্মীয় কাজে সাহায্য করেছিলেন বলে সুখ্যাতি রয়েছে।

ঢাকার অদূরে ধামরাইয়ে এখনও যে রথ টানা উৎসব পালিত হয় সেই রথ নির্মাণের ক্ষেত্রেও সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন মির্জাপুরের বাহাদুর রণদাপ্রসাদ সাহা[২]। ২৬/৬/৯৮ তারিখ শুক্রবার ধামরাইয়ের ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রার অনুষ্ঠান সম্পর্কে সৌমিত্র মানব সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে বলেছেন যে, ধামরাইয়ের ঐতিহ্যবাহী মূল রথটি ছিল ৭তলা বিশিষ্ট এবং উচ্চতা ছিল ৭০ ফুট। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তান হানাদার বাহিনী পূর্বের মূল রথটি পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবার পর তিনতলা বিশিষ্ট ও ৩০ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন আরেকটি রথ তৈরি করা হয়[৩]। অথচ একই পত্রিকায় ২৯ জুন '৯৮ তারিখে প্রকাশিত প্রবন্ধে নবীনকুমার বণিক বলেছেন, ৬১ বছর পূর্বে নির্মিত ধামরাইয়ের প্রাচীন রথটি ছিল ৩তলা বিশিষ্ট এবং এর উচ্চতা ছিল ৬০ ফুট। তিনি একস্থানে উল্লেখ করেছেন যে, ধামরাইয়ে প্রথম রথ তৈরি হয় প্রায় ৩ শত ২৬ বছর পূর্বে। এই ৩ শত ২৬ বছর

* অধ্যাপক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পুরাতন রথটি কত তলা বিশিষ্ট এবং কত ফুট উচ্চতাসম্পন্ন ছিল সে কথা তিনি কোথাও উল্লেখ করেন নি। তারাপদ সাঁতরা যে তথ্য দিয়েছেন তাতে তিন তলা বিশিষ্ট রথেরই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, "ঢাকা জেলার বেনিয়াজুড়ী ও ধামরাই প্রভৃতি গ্রামে প্রাচীন রথ এখনও আছে, তাহাদের শিল্প ও কারুকার্য্য বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের অধিকাংশই ত্রিতল বাড়ির ন্যায় বিরাট"[৪]। তারাপদ সাঁতরা হয়তো জানেন না যে, ১৯৭১ সালে ধামরাইয়ের প্রাচীন রথটি পাকবাহিনী পুড়িয়ে দিয়েছে। জানলে হয়তো ধামরাই প্রভৃতি গ্রামে প্রাচীন রথ এখনও আছে বলে মন্তব্য করতেন না। তিনি অবশ্য দীনেশচন্দ্র সেনের বর্ণনা অনুসারে যে এ-তথ্য প্রকাশ করেছেন তা স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন– "ঢাকা জেলার বেনিয়াজুড়ি ও ধামরাই প্রভৃতি গ্রামে প্রাচীন রথ এখনও আছে, তাহাদের শিল্প ও কারুকার্য্য বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের অধিকাংশই দ্বিতল ত্রিতল বাড়ির ন্যায় বিরাট"[৫]। দীনেশচন্দ্র সেন কিংবা তারাপদ সাঁতরার আলোচনায় ধামরাইয়ের রথ ৭তলা বিশিষ্ট এবং ৬০ কিংবা ৭০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট যে ছিল একথা প্রকাশ পায়নি। নবীনকুমার বণিক এবং সৌমিত্র মানব ধামরাইয়ের ৬০ কিংবা ৭০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এবং ৭তলা রথের কথা কোন সূত্রে পেলেন তা কোথাও উল্লেখ করেননি। তবে নবীনকুমার বণিক তার প্রবন্ধে উৎসবমুখর পরিবেশের যে রথটির আলোকচিত্র ছেপেছেন তা ৬তলা বিশিষ্ট বলেই অনুমিত হয়। কিন্তু প্রবন্ধকার রথের চিত্র সম্পর্কে কোন পরিচিতি দেননি। রথটি কোথাকার কিংবা কোন সময়ের তার কিছুই উল্লেখ নেই। সৌমিত্র মানব তার সংবাদচিত্রে যে রথের ছবিটি ছেপেছেন সেটি ১৯৭১-এর পরে তৈরি করা এবং ৩তলা বিশিষ্ট (৩০ ফুট উচ্চতা) বলে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান রথটি ৯চূড়া বিশিষ্ট। রথ এক বা ৯-এরও অধিক চূড়া বিশিষ্ট হয়ে থাকে। ছাদের মাঝখানে একটি চূড়া এবং তার চারকোণে চারটি চূড়া থাকলে সেইটিকে বলা হয় ৫ চূড়ার রথ। এভাবে ৫চূড়ার নিচে আর এক তলার চার কোণে আর চারটি চূড়া থাকলে তাকে বলা হয় ৯ চূড়ার রথ। এভাবে রথের তলা বৃদ্ধি পেতে থাকলে এবং প্রতি তলায় ৪টি করে চূড়া থাকলে ১৩ চূড়া, ১৭ চূড়ার রথে পরিণত হবে। ভারতের মেদিনীপুরের মহিষাদলের রথ ছিল ১৭ চূড়া বিশিষ্ট। অষ্টাদশ শতকের শেষাংশে মহিষাদলের রানী জানকী ১৭ চূড়া বিশিষ্ট যে রথটি তৈরি করেছিলেন পরবর্তী সময়ে সেটির সংস্কারসাধন করায় রথটি ১৩ চূড়ায় পরিণত হয়। সে সময় প্রায় ৪ হাজার টাকা ব্যয়ে রথের চারপাশে চারটি মূর্তি বসানো হয়েছিল। রথের বিরাটাকার ঘোড়া দুটি তৈরি করেছিলেন স্থানীয় সূত্রধর শিল্পী মাধব চন্দ্র দে[৬]।

রথের ক্ষেত্রে এমন কিছু শব্দ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে যা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন। রথের চূড়ার সংখ্যা অনুসারে যেমন রথ কত চূড়ার তা নির্ধারণ করা হয় তেমনি রথ কত বর্শার তা নির্ধারণ করারও পদ্ধতি রয়েছে। রথের কোণায় কাঠের খুঁটিতে মূর্তি থাকলে তাকে বর্শা বলা হয়। চার কোণায় চারটি মূর্তি থাকলে তাকে চার বর্শার রথ এবং অন্যতলায় আরও চারটি থাকলে আট বর্শার রথ বলা হয়। এই নামকরণ কখন কিভাবে হয়েছে তা জানা যায়না। তবে সূত্রধর শিল্পীরাই যে এসকল নামকরণ করেছেন সে বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। বর্শার ক্ষেত্রেই এই নামকরণ হয়েছে তা নয়। আরও অনেক নাম রয়েছে। রথের যে চূড়ার কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে তারও ভিন্ন নাম রয়েছে। সূত্রধর শিল্পীরা চূড়ার নাম দিয়েছেন 'পর্বতি'। আর বর্শারূপী যে সকল ভাস্কর্য রথে স্থাপন করা হয় সেই সকল ভাস্কর্যের পাশে খাড়া বা লম্বভাবে খোদাই করা নকশা-সমৃদ্ধ যে তক্তা লাগানো

হয় তার নাম দেয়া হয়েছে 'তকদিয়াল'। এমনিভাবে সারথির অবস্থানস্থলকে 'সারথিতলা', চাকার উপরে আড়াআড়িভাবে চারদিকে বেষ্টিত ঝালট 'জলপীড়া', উপরের তলার বাঁকানো কাঠের ঝালট 'সাওরন', রথের বারান্দায় ব্যবহৃত খুঁটি 'বারান্দা উবি', এবং অন্যান্য স্থানের ছোট খুঁটির নাম হয়েছে 'গেঁড়ীউবি'[৭]। রথের চওড়া অংশকে 'গাবা', এবং উচ্চতাকে বলা হয় 'উবা'। প্রকৃত অর্থে শিল্পীদের কাছেই এসকল নামের অর্থ স্পষ্ট। অর্থাৎ তারা সহজেই এসকল শব্দ যেমন উচ্চারণ করতে পারেন তেমনি শব্দগুলির প্রকৃত অর্থও অনুধাবন করতে পারেন। যা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রথ তৈরি করার নিয়মাবলি পুঁথিতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা হুবহু নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১১ ভাগে ৩ ব তাহার ৩ প্রস্থ ২ ছয় ভাগ×কাটান ৫ ভাগ সিদা

রথের তির ১১ ভাগ

সাদা আট ভাগ কাখি

তিন ভাগ করিয়া ৬ ভাগ

ইহার উপরে মেরাফ

১০ ভাগে ৫ব হয় তাহার সিদা ৪ ভাগ

৩ ভাগ ৩ ভাগ ৬ ভাগ কাটান

তাহার মধ্যে কাখি ছিনা হুল সিদা খুঁজি চিনিয়া লইতে হইবেক।

গেড়ি উবির মাথার চৌবাজ হইতে তালার অর্ধেক লইয়া সেই পরিমাণ পাড়া পিটিতে হয়। ইহার উঠান সমান অর্থাৎ নকশার প্রস্থ যত হইবেক উর্দ্ধের পরিমাণ তত হইবেক গলা আমলা দেবাসন। ঐ দেবাসন প্রতিহাতে ৮ আঙ্গুল দিতে হয়। নীচের পরিমাণ যত হইবেক উর্দ্ধদিকে তত সর্ব্ব পরিসর পর্যন্ত প্রতিহাতে এক পুয়া এক আঙ্গুল হিসাবে লইয়া দুইপাশ রাগাইবে অর্থাৎ প্রতি হাতে ৮ আঙ্গুল হিসাবে লইবে এরূপ নকশা নকশা করিয়া চূড়া করিতে হয়। এই চাল কাটাইবার হিসাব।

যত গাবা তত উবা, ছোট চূড়ার উবি বড় চূড়ার কমর বন্দীসই, পেড়ের রাগ হাতে তিন আঙ্গুল, সাউরন হাতে তিন আঙ্গুল পর্ব্বতির রাগ, পেড়ের পিটসই জত উর্দ্ধে আদট জাঙ্গি, অর্থাৎ জত উর্দ্ধে তাহার অর্ধেক জঙ্গি পর্ব্বতির পিটসই ছোট চূড়ার আট ... প্রস্থ তত খাড়াই উপরে ছাত সই।

পিড়ি উর্দ্ধে ২ ভাগ আল বাদো॥ সন ১৩১২ সাল তারিখ ২১ আষাঢ়[৮]।

বড় বড় একাধিক তলা বিশিষ্ট রথের চার কোণায় কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রিকোণাকৃতির অলংকৃত থাম ব্যবহার করা হতো। এই থামগুলি বিচিত্র নকশায় সজ্জিত থাকতো। কোন কোনটিতে জীবজন্তু এবং মানব অবয়বের সমন্বয়ে গড়ে উঠতো নকশা। স্তরে স্তরে এগুলোকে খোদাই করা হতো। মানুষের মূর্তি, তার নিচে সিংহ, সিংহের নিচে অশ্বপৃষ্ঠে অশ্বারোহী, তার নিচে অন্য কোন জন্তু, এমনিভাবে বিষয়গুলোকে খোদাই করা হতো। আর এগুলোকে এমনভাবে খোদাই করা হতো যে, দেখে মনে হবে যেন সেগুলো রথের ভেতর থেকে প্রচণ্ড গতিতে সামনের দিকে বের হয়ে আসছে। মনে হয় যেন মানুষ এবং জীবজন্তুগুলোই রথকে টেনে সামনের দিকে নিয়ে চলেছে। এমনি একটি রথের অংশ কোলকাতার গুরুসদয় মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। উল্লম্বভাবে লাগানো এসকল থামের নাম

বর্শা। এই বর্শার কথা পূবেই উল্লেখ করা হয়েছে। গুরুসদয় মিউজিয়ামে যে থামটি রয়েছে এবং তার যে নকশা সেই নকশাকে গবেষকগণ 'সংহার শৃঙ্খল' নকশা নামে অভিহিত করেছেন। কারও কারও মতে, এগুলো হচ্ছে শিবসেনা এবং কালীসেনার যুদ্ধ। কেউ কেউ অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। তাদের মতে, এগুলো মৃত্যু লতা ভাস্কর্য[৯]। লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া এণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে যে কৌণিক ভাস্কর্য সংগৃহীত হয়েছে তা মহিষমর্দিনী ও তার সহচারীদের মূর্তির প্রতীক বলে অনুমান করা হয়[১০]। রথের এই নকশা বিভিন্ন মন্দির গাত্রেও লক্ষ করা যায়। তবে শিল্পীরা কোন কোন যুক্তি বলে এরূপ নকশাকে স্থান দিলেন সে সম্পর্কে আনুমানিক তথ্য পাওয়া গেলেও সঠিক কোন তথ্য আজ অবধি কেউ দিতে পারেননি।

আলোচ্য কৌণিক ভাস্কর্য ছাড়াও রথে আবশ্যিকভাবে কিছু কাঠের মূর্তিও ব্যবহার করা হতো। এগুলির মধ্যে সারথি বা রথ চালক এবং জোড়া ঘোড়ার মুর্তিই প্রধান। এছাড়া রথের প্রতিটি চূড়ায় ডানাযুক্ত পরি বা নর্তকী এবং কেন্দ্রীয় চূড়ায় গরুর মূর্তি বসানো হতো। রথের কোণায় কোণায় বিভিন্ন ধরনের মূর্তিও বসানো থাকতো। যার মধ্যে বাদক-বাদিকা, চামরধারিণী, নর্তকী, কলসি কাঁখে গ্রাম্যবধূ, রমণীর মাছকোটা, কৌপীনধারী মহন্ত, টুপি পরিহিত ইউরোপীয় সাহেব, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, কৃষ্ণ জন্ম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য[১১]। এক সময় কুমিল্লার কোন রথে কৃষ্ণ-জন্ম নামক ভাস্কর্য ছিল। বর্তমানে সেটি কোলকাতার গুরুসদয় মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। এই মূর্তিটিকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনে করা হয়ে থাকে। কারণ সন্তান প্রসবকালে যেভাবে গর্ভবতী রমণীকে হাঁটুমুড়ে শোয়ানো হয় সেই ভাবব্যঞ্জনাটি এখানে উপস্থিত। বাংলার রমণীদের জন্য যা শিক্ষণীয় বিষয়। এসকল বিষয়ের পাশাপাশি রথের প্যানেলে মিথুন মূর্তিও খোদাই করা হতো। এমনি ধরনের মিথুন মূর্তি সম্বলিত প্যানেল সমৃদ্ধ রথ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও ছিল। কুমিল্লা, ঢাকা, যশোর, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার নির্মিত রথে মিথুন মূর্তিসহ বিভিন্ন ধরনের মূর্তি যে খোদাই করা হতো তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আশুতোষ এবং গুরুসদয় মিউজিয়ামে রয়েছে। ঢাকার অদূরে ধামরাই-এর পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে মিথুন দৃশ্য সম্বলিত নতোন্নত নকশার একটি আকর্ষণীয় রথ ছিল। বর্তমানে রথটি অক্ষত রয়েছে কিনা বলা কঠিন। কারণ বাংলাদেশে যে সকল বৃহৎ আকৃতির রথ রয়েছে তার সিংহভাগই রয়েছে পরিত্যক্ত অবস্থায়। ফলে সে সকল রথের মূর্তি, ঘোড়া এবং অন্যান্য নকশা সমৃদ্ধ প্যানেল চুরি হয়ে দেশের বিভিন্ন বিপনি কেন্দ্রের মাধ্যমে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। আবার বয়সের ভারে ভেঙে পড়ায় কেউ কেউ এগুলোকে নিজেরাই স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে দিচ্ছে। বহু হাত ঘুরে সে সকল নকশা, মূর্তি, ঘোড়া দেশের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে স্থান লাভ করছে। সেখান থেকে দেশে এবং দেশের বাইরে বিত্তবানদের সংগ্রহে যাচ্ছে।

শেরপুর জমিদার বাড়ির প্রাচীন রথটিও বহু বছর যাবৎ পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। এই রথেরও বিভিন্ন অংশ খোয়া গেছে। শেরপুরের নয়আনি জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরীর আর্থিক সহযোগিতায় নির্মিত হয়েছিল এই রথ। রথটির বয়স ৭০ বছরের অধিক বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, বয়স তারও বেশি। বয়স অধিক হতে পারে। কারণ জমিদার বাড়ির কাঠের তৈরী নাট মন্দিরসহ অন্যান্য মন্দির ১৫০-২০০ বছর পূর্বে নির্মিত বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন। নাট মন্দিরের সম্মুখস্থ কালী মন্দির-এ বসবাসকারী নিমাইচন্দ্র বর্মণসহ সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সের গোপিনাথ কর্মকার, কৃষ্ণ চক্রবর্তীও সঠিক করে এগুলোর নির্মাণকাল উল্লেখ

করতে পারেননি। তারাও অনুমান নির্ভর সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন এবং ৭০ বছর-এর অধিক পূর্বে নির্মিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে ১৬/১২/৯৮ তারিখে ঢাকার *বাংলাবাজার* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে রথের বয়স ৭৩ বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরীর মাতা পুণ্যময়ী তারামণি চৌধুরানীর নির্দেশে রথটি তৈরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রথটি ১৬টি লোহার চাকার উপর প্রতিষ্ঠিত। উচ্চতা ১৭ ফুট। দুই তলা বিশিষ্ট রথের মূল চূড়াটি রয়েছে কালী মন্দিরে। শেরপুর বাজার সংলগ্ন গোপালবাড়ির আঙিনায় রাস্তার ধারে একটি টিনের চালাঘরের মধ্যে রথটিকে অনাদরেই রাখা হয়েছে। ঘরের দু'দিক উন্মুক্ত। ফলে ঝড়-বৃষ্টির আঘাতে রথটি ক্রমান্বয়ে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এক সময় কাঠে পচন ধরলে হয়তো সমূলেই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

রথের সম্মুখে মোট দশটি খুঁটি রয়েছে। এর মধ্যে ছয়টি কুঁদে তৈরি করা। কুঁদে তৈরী জোড়া খুঁটি রয়েছে মাঝের অংশে। এখানে পাশাপাশি দুই পাশে দুটো করে খুঁটি রয়েছে এই অংশের উভয় পাশে রয়েছে একটি কুঁদে তৈরী এবং অন্য একটি সাধারণ চারকোণা খুঁটি। এই দু'টি খুঁটিও পাশাপাশি গা ঘেঁষে অবস্থান করছে। উভয় প্রকার জোড়া খুঁটির পাশে সামান্য দূরত্বে রয়েছে আর একটি সাধারণ চৌকোণাকার খুঁটি। তবে এই কোণার খুঁটির অংশে বর্শা নামের কোন অলংকৃত থাম নেই যা সাধারণত রথে থাকে। জোড়া খুঁটিগুলোর উপর এবং নিচের অংশে অবশ্য নকশা রয়েছে। খুঁটিগুলোর উপরে রয়েছে, ইমারতে ব্যবহৃত খিলান সদৃশ অর্ধগোলাকার খিলান। মাঝের খিলানটি বড়। তার উভয় পাশের খিলান অপেক্ষাকৃত ছোট। এবং এ দুটোর পাশের খিলান আরও ছোট, এবং খিলানের আকৃতিও ভিন্ন স্বভাবের। উপরের দিকে কৌণিক আকৃতির। নিচ তলার কার্নিশের চার দিকেই লতানো নকশা রয়েছে। কার্নিশের যে অংশ বাইরের দিকে বের হয়ে রয়েছে সেই অংশের নিচে রয়েছে ছোট ছোট চৌকো ঝুলন্ত নকশা। রথের চার দিকেই একইভাবে খুঁটি, খিলান এবং কার্নিশ স্থাপন করা রয়েছে। খুঁটি, খিলান এবং কার্নিশ দ্বারা ঘেরা চার অংশের অভ্যন্তরে রয়েছে আর একটি কক্ষ। এই কক্ষের চার পাশেও রয়েছে কুঁদে তৈরী অসংখ্য খুঁটি এবং খিলান। খুঁটির সঙ্গে যুক্ত রেলিং-এ তাসের চিরাতনের সাদৃশ্য নকশা রয়েছে। নকশাগুলো কাঠের পাটা এপার ওপার কেটে খোদাই করা। রেলিং-এর পাশে এবং যুক্ত খুঁটির নিচের বর্গাকার এবং আয়তাকার ক্ষেত্রগুলোতে একটি করে ফুল নতোন্নত পদ্ধতিতে খোদাই করা হয়েছে। রথের মেঝের নিচে পৈঠা বা পাশিগুলোতে দুই স্তরে কার্নিশের ব্যবহার রয়েছে। নিচের দিকে দ্বিতীয় কার্নিশের নিচে রয়েছে বিশেষ ধরনের নকশা। ঘোড়ার পায়ের খুরাকৃতির ফর্ম সারিবদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে। খুরাকৃতি নকশার সঙ্গে নিচের দিকে যুক্ত রয়েছে অসংখ্য পদ্ম পাপড়ি সদৃশ সারিবদ্ধ নকশা। নকশাযুক্ত এই প্যানেল বা পৈঠা দিয়ে চারদিকে ঘেরা অংশের মধ্যে রয়েছে ১৬টি লোহার চাকা।

দ্বিতীয় তলার চার দিকেও কুঁদে তৈরী অসংখ্য খুঁটি রয়েছে। তবে চার কোণায় চারটি সাধারণ চার কোণাকৃতির খুঁটি আছে। মাঝে রয়েছে পাশাপাশি স্থাপিত দুটো জোড়া খুঁটি। জোড়া খুঁটিদ্বয়ের উপরে রয়েছে অর্ধগোলাকৃতির খিলান জোড়া খুঁটিদ্বয়ের উভয় পাশে, অর্থাৎ উভয় কোণায় সাধারণ খুঁটির সঙ্গে রয়েছে একটি করে কুঁদে তৈরী খুঁটি। এই দুটি অংশেও মাঝের অংশের সমমাপের সমআকৃতির খিলান রয়েছে। এই অংশে খিলানের কার্নিশগুলো হলুদ রঙে রাঙানো। খিলান বরাবর নিচে খুঁটিগুলোর উপরের অংশেও হলুদ রং দেওয়া। হলুদ রংয়ের নিচে কালো রংয়ের প্রলেপও রয়েছে। খিলানের উপর ফুল-পাতা, এবং কার্নিশের নিচে চৌকো কাঠের চেইন নকশা রয়েছে।

কার্নিশের এই চেইন নকশার উপরের প্যানেলে রয়েছে লতা-পাতা এবং ফুলের চলমান নকশা। এই নকশার উপরে চার দিকে বের হয়ে আসা অংশের তলায় নিচতলার মতই চৌকো ফর্ম নিচের দিকে ঝুলে রয়েছে। ফর্মগুলো উপর থেকে ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে নেমেছে। কার্নিশের উপরে রেলিং-এর মতো করে ঝালর নকশা স্থাপন করা হয়েছে। উপরের তলার চারদিকেও একরকম খুঁটি, খিলান এবং অলংকরণ রয়েছে। খুঁটি, খিলান, এবং অলংকৃত কার্নিশে ঘেরা চার দেয়ালের মাঝেও নিচ তলার অনুসরণে একটি কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। এই অংশের অনেক মূল্যবান কাঠ চুরি হয়ে গেছে। বাইরের চার দিকের ১২ খিলানে ঘেরা মাল্টিকক্ষের চার কোণায় রয়েছে চারটি চূড়া। চূড়া চারটির প্রত্যেকটিতে চারটি করে খুঁটি, খিলান, কার্নিশ এবং চালা রয়েছে। তবে একটি চূড়া ইতোমধ্যেই খোয়া গেছে। মাঝের বড় চূড়াটিতে রয়েছে ৮টি খিলান। উভয় দিককার খুঁটির উপর এই খিলান স্থাপিত। প্রতিটি খিলানই অর্ধ গোলাকৃতির। খিলানের নিচে উভয় পাশে ঠিক মাঝে রয়েছে একটি করে সোজা সাধারণ খুঁটি। এই খুঁটির সঙ্গেই যুক্ত করা রয়েছে গায়ে গায়ে লাগানো দুটো করে কুঁদে তৈরী খুঁটি। চূড়াটি অষ্টকোণাকৃতির। চূড়ার কার্নিশে চিরাতনের প্যানেল নকশা রয়েছে। কার্নিশের উপরে রয়েছে ধাপে ধাপে তৈরী অষ্টকোণাকৃতির চালা। চালাটির সর্বত্রই সূক্ষ্ম নকশায় পূর্ণ। চূড়ার শীর্ষে দুটো ঘটি নকশা রয়েছে। কুঁদে তৈরী পর পর উপর নিচে সাজানো ঘটি দুটোর উপরে আরও দুটো ক্ষুদ্রাকৃতির ঘটি রয়েছে। তার উপর, অর্থাৎ চূড়ার শীর্ষে রয়েছে পদ্মকলি। এই চূড়ার প্রায় সর্বত্র নীল রং করা হয়েছে। কুঁদে তৈরী খুঁটিগুলোতে রয়েছে গোলাপী রং। চূড়ার শীর্ষের পদ্মকলিটি লাল, পদ্মকলির নিচের ক্ষুদ্র ঘটি দুটি কালো, কালো ঘটিদ্বয়ের নিচের বড় ঘটির একটি হলুদ এবং অন্যটি নীল রং-এ রঞ্জিত। নীল ঘটির নিচের সামান্য অংশ লাল হলুদের প্রলেপ দেওয়া। খিলানের উপরের প্রতিটি প্যানেলে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাম রাম হরে হরে' কথাগুলো বাংলা হরফে লেখা রয়েছে। এই রাম নাম লেখার সঙ্গে অবশ্য রথের কোন সম্পর্ক নেই। যে মন্দিরে এই চূড়াটি রক্ষিত সেই মন্দিরের পাশের একটি কক্ষে ৪০ বছর যাবৎ বসবাসরত নিমাই বর্মণ বলেছেন, কীর্তনের সময় এই চূড়াটি ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কৃষ্ণ নাম লেখা এই চূড়াকে কেন্দ্র করেই কীর্তন জপ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

নিমাই চন্দ্র বর্মণ জানান, জমিদারদের এই মন্দির 'স্বর্গীয় সুরেন্দ্রমোহন সাহা ট্রাস্ট' দ্বারা পরিচালিত হয়। যার সভাপতি হচ্ছেন শম্ভুনাথ পোদ্দার এবং সেক্রেটারি পরিতোষ পাল। নিমাই চন্দ্র বর্মণ আরও জানান যে, মূল রথটি কালী মন্দিরেই রক্ষিত ছিল, মূল চূড়াটি এখন যেখানে রয়েছে। পরবর্তী সময়ে রথটিকে বর্তমান স্থানে স্থানান্তর করা হয়। জানা গেছে, এই রথেও রথচালক সারথী এবং কাঠের ঘোড়া ছিল, পরবর্তী সময়ে এগুলো চুরি হয়ে গেছে। রথের অলংকৃত কার্নিশও ছিল, কিন্তু এখন নেই। কেউ খুলে নিয়ে গেছে। রথটি সর্বশেষ টানা হয়েছে ১৯৫৭ সালে। এর পর থেকেই পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময়ও এই রথের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা রথের কিছু কিছু অংশ ঢাকা ডি.এম.সি. সুপার মার্কেট, গুলশান-২ এই ঠিকানার কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে। এর মধ্যে রাজিয়া হ্যাণ্ডিক্রাফটস, এফ-৪৪-এ রয়েছে রথের কয়েকটি কার্নিশ। কার্নিশগুলোর গায়ে খোদাই করা রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মূর্তি। কার্নিশের নিচের অংশে অর্ধগোলাকৃতির খিলান রয়েছে। প্রতিটি খিলানের অভ্যন্তরে একই

স্বভাবের নারী মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। উল্টো হয়ে মাথা-পা ভূমিতে রেখে যেভাবে শরীরকে উপরের দিকে ধনুকের মতো বাকানো হয়, ঠিক সেইভাবে মূর্তিগুলো অবস্থান করছে। খিলানের বক্র কার্নিশের মধ্য অংশে একই আকৃতির সম অঙ্গভঙ্গির একটি করে মূর্তি এবং দুই খিলানের নিচের সংযোগস্থলে বিভিন্ন স্বভাবের একটি করে মূর্তি দণ্ডায়মান অবস্থায় রয়েছে। ফলে খিলানের কার্নিশের উপর দাঁড়ানো মূর্তিগুলো আকৃতিতে বড়। সংযোগস্থলে দাঁড়ানো এক একটি মূর্তি এক এক ধরনের। কোনটির দুই হাত, কোনটির আবার চার হাত রয়েছে। কার্নিশের উপরের অংশ ঢেউ-এর মত উঁচু নিচু। এই অংশকে খোদাই করে নকশায় পরিণত করা হয়েছে। এই অংশের ঢেউ-এর অনুরূপ প্রতিটি নিচু অংশে বিশেষ ভঙ্গির একটি করে টিয়া পাখি খোদাই করা হয়েছে। প্রতিটি টিয়া তার মাথাটি পিছন দিকে ফিরিয়ে পিঠের উপর স্থাপন করে রয়েছে।

কাঁসা সেন্টার নামক প্রতিষ্ঠানে রয়েছে একটি উপবিষ্ট মূর্তি। মূর্তিটি বেশ স্থূলকায়। পরিধেয় বস্ত্রটির সামনে কুঁচি দেয়া। দেহের উপরের অংশ উদোম। ফলে তার স্ফীত নাদুস নুদুস ভুঁড়িটি উপলব্ধি করা যায়। ডান হাত নিচে পা-এর উপর রাখা। ডান পা-খানি ভাঁজ করে উপরের দিকে উঠিয়ে বসা। বাম পা নিচে ভূমি স্পর্শ করে রয়েছে। বাম হাতখানা উপরের দিকে অভয় মুদ্রার অনুরূপভাবে উঠানো। মূর্তিটি এমনভাবে বসে রয়েছে দেখে মনে হবে উঁচু কোন আসনের উপর বসা। মাথার লম্বা চুল পিছন দিয়ে ঘাড়ের নিচে পর্যন্ত নেমে গেছে। মূর্তিটির দেহ হলুদ রঙে রাঙানো। পরিধেয় বস্ত্রটি নীল। প্রতিষ্ঠানের মালিক জানান মূর্তিটি কোন রথের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

বাংলাদেশে বর্তমানে রথের সংখ্যা নানা কারণে কমতে শুরু করেছে। যেগুলো অবশিষ্ট রয়েছে সেগুলোও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিনষ্ট এবং বিলুপ্ত হতে চলেছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বিশেষ করে রাজা, জমিদার এবং বিত্তবান ব্যক্তিরা দেশবিভাগের পর ভারতে চলে যাওয়ায় নতুন রথ যেমন তৈরি করা হচ্ছেনা তেমনি পুরাতন রথগুলিও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। অথচ এক সময় ছিল যখন রথ এবং রথ উৎসব অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। বিত্তবান ব্যক্তিদের সহায়তায় প্রচুর রথ নির্মিত হয়েছে। নাটোরের রাজা রামকান্ত রায় ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ থানার সাদেকাবাগ গ্রামের জন্য একটি রথ নির্মাণে সাহায্য করেছিলেন। জমিদার রামকান্তের আর্থিক সাহায্যে মহন্ত মস্তরামজী ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে রথটি নির্মাণ করান[১২]। রথটির ১৭টি চূড়া এবং ৩২টি চাকা ছিল। রথটি ১৭৮ বছর পর্যন্ত টিকেছিল। এরপর নষ্ট হয়ে যায়। রাজা রামকান্ত রায় জমিদারি পরিচালনায় উদাসীন ছিলেন। কারণ ধর্মকর্মেই তিনি অধিক সময় ব্যয় করতেন। ফলে তার স্বনামধন্যা স্ত্রী রানী ভবানীই জমিদারি পরিচালনা করতেন। সাদেকবাগের রথটি নির্মাণের ৬ বছর পর রাজা রামকান্ত রায় পরলোক গমন করেন। জমিদারির ভার রানী ভবানীর উপর ন্যস্ত হলে তিনিও উভয় বাংলার বহু স্থানে মন্দির নির্মাণসহ নানাভাবে ধর্মীয় কাজে সাহায্য করেন। তিনি ১২ হাজার বিঘা ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর জমি দান করেন[১৩]।

রাজা রামকান্ত রায় এবং জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরীদের মত উদার হৃদয় দানশীল ব্যক্তিদের সাহায্য সহযোগিতায় বাংলাদেশের কুমিল্লা, ঢাকা, যশোর, ফরিদপুর, খুলনা, সিলেটসহ বিভিন্ন জেলায় এক সময় বহু রথ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সে সকল রথ প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। স্মৃতি হিসেবে কোন কোন রথের খণ্ডাংশ, কিংবা মূর্তি আজও ভারতের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। যেমন– গুরুসদয় মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে কুমিল্লার রথের প্যানেল। এই প্যানেলে রাম রাবণের যুদ্ধ,

চণ্ডীকাহিনী, শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধসহ বিভিন্ন দৃশ্য খোদাই করা হয়েছে[১৪]। গুরুসদয় ও আশুতোষ মিউজিয়ামে রয়েছে কুমিল্লা, ঢাকা, যশোর, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার রথের পুতুল[১৫]। যশোর থেকে যে সকল পুতুল সংগ্রহ করা হয়েছে তার মধ্যে নীলকর সাহেব, প্রার্থনারত খ্রীষ্টান মহিলা, মেম সাহেব, রন্ধনরতা রমণী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত পুতুলের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। খোদাই কাজের এসমস্ত বিষয় অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। কলসি কাঁখে মেয়ের খোদাই এমনভাবে করা হয়েছে যে, ভেজা কাপড়ের ভাঁজগুলো এবং দেহে সেঁটে থাকবার অবস্থাটি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সাহেব এবং মেম সাহেবদের পোশাক পরিচ্ছদে ইংরেজ চরিত্র স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এরূপ শিল্প নির্মাণের শিল্পী যারা তাদের মধ্যে রংপুর জেলার তাম্বুলপুর-ইমামগঞ্জের পরলোকগত যুগল চন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি রথ নির্মাণে এতই দক্ষতা এবং সুনাম অর্জন করেছিলেন যে, ডিমলা, তুষ, ডাঙ্গার, কাকিনাবামনভাঙ্গা, তাম্বুলপুর, মহিমাগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের জমিদার ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের রথগুলো তাকে দিয়ে তৈরি করানো হয়েছিল। তিনি রথে ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষয়কে এতটাই বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরতেন যে, সকলে বিস্ময়ের সঙ্গে সেগুলো চেয়ে চেয়ে দেখতেন। যদি কেউ তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন কিংবা তাকে ঠকাতেন তাহলে তাদের নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক মূর্তি খোদাই করে রথের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করতেন। এরূপ ক্ষেত্রে জনগণ বুঝতে পারতেন কাকে নিয়ে মূর্তিগুলো রচনা করা হয়েছে। এমনি একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন সে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "তাম্বুলপুরের গদাধর আচার্য্যের বাড়িতে তিনি (যুগলচন্দ্র) একটি সুন্দর রথ নির্মাণ করেন। রথের পার্শ্ব দেশে ভোজন জেলেনী নামক একটি ধীবর-কন্যার হুবহু মূর্তি নির্মাণ করেন। ভোজন যুগলচন্দ্রকে মাছ দিতে চায় নাই। সুতরাং ভোজনকে লোকচক্ষে হাস্যাস্পদ করবার জন্য মাছের চুপড়ি সম্মুখে করে রথের পার্শ্বে বসিয়েছেন। এই দারুমূর্তি এরূপ স্বাভাবিক হয়েছিল যে, যে কেউ দর্শন করতো উহা ভোজনের মূর্তি বলে চিনতে পারতো"[১৬]।

যুগলচন্দ্রের মতো অনেক দক্ষ দারুশিল্পী বাংলাদেশে ছিলেন, যাদের সৃষ্ট দারুশিল্প দেশের জন্য গৌরবের বিষয়। অথচ এসকল শিল্পী সম্পর্কে দেশের মানুষ অবহিত নন। শুধু তাই নয়, এদের সৃষ্ট দারুশিল্প সম্পর্কেও তারা কিছু জানেনা। সুতরাং এসকল শিল্পী এবং তাদের শিল্প বিষয়ে আরও অধিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং এসকল তথ্য প্রচার ও শিল্পীদের শিল্পকর্ম দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য সংরক্ষণ করা জরুরি।

তথ্যনির্দেশ

১. তারাপদ সাঁতরা, *বাংলার দারুভাস্কর্য,* আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ. ২৬

২. দৈনিক *বাংলাবাজার* পত্রিকা, ঢাকা, ২৯ জুন ১৯৯৮, পৃ. ৬

৩. পূর্বোক্ত, ৩০ জুন ১৯৯৮

৪. তারাপদ সাঁতরা, *বাংলার দারুভাস্কর্য,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

৫. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ,* ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ১৯৯৯, পৃ. ৪১৯

৬. তারাপদ সাঁতরা, *বাংলার দারুভাস্কর্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

১৩. এম. এ. হামিদ, *চলনবিলের ইতিকথা*, আমাদের দেশ প্রকাশনী, পাবনা, ১৯৬৭, পৃ. ২৬৮

১৪. তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প*, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ১৩৩-১৩৪

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫

১৬. তারাপদ সাঁতরা, *বাংলার দারুভাস্কর্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২